অসুস্থ রাজনীতিতে নতুন প্রেসক্রিপশন

‘এ সরকারকে কোনো সেক্টরেই পাশ নম্বর দেয়া যাচ্ছে না’

অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী

হুমায়ুন আজাদের প্রসঙ্গটাই ধরা যাক। একজন শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিক্ষক মৃত্যুর দরজায়। আর ময়দানে তাকে নিয়ে লড়াই করছে বিএনপি-আওয়ামী লীগ। ক্ষমতাসীন খালেদা জিয়া সরাসরি অভিযুক্ত করছেন বিরোধী দল আওয়ামী লীগকে কোনো প্রমাণ ছাড়াই। হাসিনাও ক্ষমতায় থাকতে একই কাজ করেছিলেন যশোরের উদীচী ট্র্যাজেডি নিয়ে। আর দর্শক হিসেবে এই চিত্র দেখতে দেখতে ক্লান্ত জনগণ। হতাশ দেশবাসী এখন রাজনীতি আর রাজনীতিবিদদের যে কোনো প্রসঙ্গেই বিরক্ত। তারা জানে পাঁচ বছরে একবার এরা ভোট ভিক্ষার ঝোলা নিয়ে বের হয়। মুখে থাকে খুবই সুন্দর সুন্দর কথা। তারপর সেই আগের অবস্থাই। একই চিত্র। হয়তো শাসকের নাম বদলায়। এ অবস্থায় মানুষ কোনো রাজনীতিবিদকেই বিশ্বাস করতে পারে না। কারোর কথাতেই আস্থা রাখা যায় না। শুধু কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত দেশের মানুষ তাই কোনো রাজনীতিবিদদের নতুন কর্মকান্ড দেখলে সন্দিহান হয়ে পড়ে। ধরে নেয় নিশ্চয়ই এর মাঝে আছে কোনো হিসাব-নিকাশ। চাপের মুখে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর বছরখানেক পর নতুন ফর্মুলা নিয়ে বদরুদ্দোজা চৌধুরীর হঠাৎ আগমন তাই অনেক সন্দেহ তৈরি করে। একই সময়ে আওয়ামী লীগ ভবিষ্যদ্বাণী করছিল মার্চ-এপ্রিলে সরকার পরিবর্তন হবে। সেনাবাহিনীও তার কিছুদিন আগে মাঠ গরম রেখেছিল। এমন সময় বি. চৌধুরীর তৃতীয় ধারা এবং সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করে রাজনীতির নতুন প্রেসক্রিপশন নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক ছিল। এরপর তিন মাসে তৃতীয় ধারা বিকল্প ধারা হিসেবে কিছুটা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তাও প্রচার মাধ্যমে।

সাবেক রাষ্ট্রপতি তার বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা দিয়ে ‘যেমন বাংলাদেশ চেয়েছিলাম’ নামে একটি বইও প্রকাশ করেছেন এই ফেব্রুয়ারিতে। তার বিভিন্ন বক্তব্য স্পষ্ট। প্রচলিত রাজনৈতিক ধারার বাইরে। কিন্তু কার্যক্রম এখনো একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে। মার্চের ৯ তারিখে পল্টন ময়দানে নাগরিক কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। বলছেন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা আসবে আরো তিন মাস পরে। যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনের সাফল্যের বিষয়ে আশাবাদী তিনি। তার এই বিশ্বাস এসেছে হয়তো ‘সাবাস বাংলাদেশ’-এর সফল প্রচারণার জন্য। কিন্তু একটি অঙ্ক ছিল তখন। তখন ছিল বিএনপির প্ল্যাটফর্ম। জিয়ার ছবি ছিল পেছনে। এখন শুধু জিয়া নন পেছনে আছেন মুজিব, ভাসানী, ওসমানীও। কিন্তু প্ল্যাটফর্ম বদলে গেছে। প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে তিনি কতটুকু কি করতে পারবেন তা সময়ই বলে দেবে। কেন আবার রাজনীতিতে জড়ালেন, কি তার নতুন চিন্তা-ভাবনা সব প্রসঙ্গেই কথা বলেছেন।

বারিধারার কেসি মেমোরিয়াল হাসপাতাল। সম্পাদক **শাহাদত চৌধুরীর সঙ্গে** পৌঁছালাম বিকেল পাঁচটায়। চালু হলো রেকর্ডার। ছবি তুলতে শুরু করলেন **তুহিন হোসেন**।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মোহসিউল আদনান**

সাপ্তাহিক ২০০০ : বিএনপির প্রবীণতম সদস্য হয়েও আজকে আপনার অবস্থান সরকারের বিরুদ্ধে। আপনার বর্তমান কার্যক্রমের তিনটি কারণ হতে পারে। বিএনপির অন্তর্দ্বন্দ্ব, আপনার ইগো অথবা দেশের ক্রাইসিসে এগিয়ে আসা। আপনি কি মনে করেন?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : একটা একটা করে বলি, প্রথমটা হলো বিএনপির অন্তর্দ্বন্দ্ব। অন্তর্দ্বন্দ্ব যদি হতো, তাহলে প্রথম কথা যে কারণে দ্বন্দ্বটা হয়েছিল, মনে করা হয় যদি আমার পদত্যাগের প্রশ্নে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই রিঅ্যাকশনটা হতো। দ্বিতীয়ত, আমি পরিষ্কার ঘোষণা করতাম বিএনপি ভেঙে আরেকটা বিএনপি করছি। তৃতীয়ত আমি বলতাম বিএনপির প্রোগ্রাম, সংবিধানে যা যা আছে আমি তার সবগুলোতেই একমত। কিন্তু আমি কোনোটাই করি নাই। তাহলে মিলল না, বাদ হয়ে গেল।

> একটি সাধারণ অঙ্ক আপনারা ভুলে যাচ্ছেন। যেদিন আমি প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রার্থী হলাম, সে দিন থেকে আমি বিএনপির কেউ না। আমি দল থেকে পদত্যাগ করেছিলাম। সুতরাং আমার তো কোনো অধিকার নাই বিএনপিকে কিছু বলার। যেদিন থেকে প্রেসিডেন্ট হলাম তখন থেকে তো আমি নিরপেক্ষ এবং সেই নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। তারপর তো বিএনপিকে আমি কিছু বলতে পারি না

এবার আসি আপনার দ্বিতীয় পয়েন্টে। ইগো। এটা একটা কঠিন প্রশ্ন। আমি মনে করি না এটা ইগোর প্রশ্ন। আপনি আপনার ইগোতে আঘাত লাগলে পকেটে লুকিয়ে বেশিক্ষণ রাখতে পারবেন না। সঙ্গে সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করতেন।

তৃতীয়টা হলো দেশের ক্রাইসিস। ইয়েস, ইয়েস, আমি যেদিন পদত্যাগ করেছিলাম সেদিন বলেছিলাম দেশের কোনো সংকটে আমার প্রয়োজন হলে আমি অবশ্যই রেসপন্ড করবো। এটা তো নতুন কোনো কথা নয়, হঠাৎ করে বললাম তাও নয়। পদত্যাগের আধ ঘন্টা পরই প্রতিক্রিয়ায় টিভিতে আমি বলেছিলাম যে দেশের কোনো প্রয়োজনে আমি আবার কথা বলবো, যা করার তাই-ই করবো। সুতরাং এখন আপনারাই বলুন কোনটা হবার কথা।

২০০০ : আপনি বলুন?

বি. চৌধুরী : তৃতীয়টিই হবার কথা। দেশের বর্তমান সংকটে এগিয়ে এসেছি।

২০০০ : এই সংকটকে আপনি কিভাবে ডায়াগনসিস করছেন?

বি. চৌধুরী : একটা সরকার যখন ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নির্বাচিত হয়, তখন সেই সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশাও থাকে অনেক। কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণে বর্তমান সরকার ব্যর্থ হয়েছে। সফলভাবে দেশ পরিচালনার জন্য একটি নবনির্বাচিত সরকারকে অন্ততপক্ষে ২ বছর সময় দেয়া উচিত। আমি যখন রিঅ্যাক্ট করলাম তখন ২ বছর পার হয়ে গেছে। ২০০৩ সালের নবেম্বর মাসে এসে আমি ভেবেছি, এটাই রিঅ্যাক্ট করার উপযুক্ত সময়। কেননা সব দিক মিলিয়েই সরকার ছিল ব্যর্থ। বর্তমান সরকার সন্ত্রাস তো দমন করতে পারেইনি বরং এই সময়ে র‌্যাপিডলি সন্ত্রাস বেড়েছে। জনজীবনে কোনো রকম নিরাপত্তাই এখন আর নেই। কিছু কিছু সন্ত্রাস থাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে। যেমন জমিজমা নিয়ে বিরোধে ৩ ব্যক্তির মৃত্যু। এসব ক্ষেত্রে সরকারের খুব বেশি কিছু করার থাকে না। সবচেয়ে যেটা ভয়াবহ, সেটি হলো পলিটিক্যাল সন্ত্রাস। বর্তমানে এই সন্ত্রাসের বিস্তৃতি বহুদূর। পলিটিক্যাল সন্ত্রাস আমরা কোনটিকে বলবো? এই যে শেখ হাসিনাকে মিটিং করতে দেয়া হলো না, ড. কামালের গাড়িবহরে হামলা হলো- এগুলো পলিটিক্যাল সন্ত্রাস। সাংবাদিক হত্যা, রাজনৈতিক কর্মী হত্যা, রাজনীতিবিদদের শেল্টারে বিপক্ষের লোকজনকে পিটিয়ে লাশ করা, বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলা- এমন সন্ত্রাসের একশ' ভাগ দায়িত্ব সরকারের। আর রাস্তাঘাটে চুরি-ডাকাতি এটারও একটা নিরাপত্তা সরকারকে দিতে হবে। যতদূর সম্ভব দিতে হবে। ১০০% কেউ পারে নাই, তবে সভ্য সমাজে যতটুকু সম্ভব তা দিতে হবে। সব মিলিয়ে সন্ত্রাস অনেক বেড়ে গেছে। এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এরপর আসি দুর্নীতি প্রসঙ্গে। দুর্নীতির কথাও আর নতুন করে কিছু বলার নেই। কোথাও কোথাও কিছু কিছু দুর্নীতি হতে পারে। কিন্তু সেটার তো একটা লিমিট থাকবে। অথচ আমাদের দেশে দুর্নীতির কোনো সীমা নেই। সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি করছে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা। ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের এই দুর্নীতির জবাবদিহিতা কে করবে? সরকারকেই তো করতে হবে। টপ বুরোক্রেসিও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। আবার কোনো কোনো শিল্পপতি, ব্যবসায়ী আছেন, যারা ব্যাংক থেকে জনগণের টাকা নিয়ে সে টাকা ফেরত দেন না। এটাও এক ধরনের দুর্নীতি।

দুর্নীতি খুবই স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড একটি বিষয়। যদি শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি দুর্নীতিবাজ না হন বা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেন, তাহলে তার অধীনস্থ লোকদের দুর্নীতি করার কথা নয়। সে সাহস তারা পাবে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করবে, তাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির থাকে একচ্ছত্র ক্ষমতা। কোনো মন্ত্রীর ব্যাপারে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে হি ক্যান কিক হিম আউট। অথবা তাকে পদত্যাগ করতে বলতে পারেন। সে ক্ষমতা তার আছে। একইভাবে যে অফিসার দুর্নীতি করে, তাকেও বলতে পারেন চলে যাও। কিন্তু যখন এটা করেন তখন দুর্নীতি কমবে কিভাবে। এই যে বিশাল মন্ত্রিসভা থেকে মাত্র ৭ জনকে সরানো হলো সেটাও যে দুর্নীতির অভিযোগে এ কথা স্পষ্ট করে সরকার বলেনি। দুর্নীতির অভিযোগে কাউকেই বিদায় করা হয়নি। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, দুর্নীতির ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপই সরকার নেয়নি। কোনো সরকারি কর্মচারীকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়নি। অভিযুক্ত করা হয়নি কোনো মন্ত্রীকেও। অথবা রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সম্পৃক্ত এমন কারো বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেবার কথা শুনিনি। এটা সত্যি কথা, দুর্নীতি এ দেশে আছে এবং দিনে দিনে এর শুধু আকারই বাড়ছে।

তিন নম্বর। দারিদ্র্য দূরীকরণেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ সরকার এখন পর্যন্ত নিতে পারেনি।

২০০০ : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রসঙ্গটা....

বি. চৌধুরী : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি তো বর্তমানে অসহনীয় পর্যায়ে। সাধারণ গরিব মানুষের পক্ষে এই দ্রব্যমূল্যের ঝাঁঝ সহ্য করা কঠিন। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছিলাম, দারিদ্র্য দূরীকরণের কথা। দারিদ্র্যকে যদি দূর করা যেতো, তাহলে দ্রব্যমূল্য এই অসহনীয় পর্যায়ে যেতে পারতো না। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে ইংল্যান্ড, আমেরিকায় জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি। কিন্তু ওসব দেশের জনগণের কাছে সেটা মনে হয় না। কারণ তাদের উপার্জনও বেশি। তাই আমাদের দেশের লোকদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে। এটা হচ্ছে প্রথম প্রায়োরিটি।

দ্বিতীয়ত, দ্রব্যমূল্যের যাতে অহেতুক বৃদ্ধি না ঘটে সে জন্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। খুব সহজেই দ্রব্যমূল্যের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ঢাকার বাজারে শাকসবজি, মাছের দাম আকাশচুম্বী। কিন্তু যদি এগুলোর উৎসস্থল গ্রামে যান, তাহলে দেখবেন সেগুলো কতো সস্তা। গ্রাম থেকে শহরে এলেই শাকসবজি, মাছের দাম এতো বেড়ে যায় কেন? কারণ আর কিছুই না- চাঁদাবাজি। এসব দ্রব্য বহনকারী ট্রাককে পথে পথে যে পরিমাণ চাঁদা দিতে হয়, তাতে ঢাকার বাজারে সেগুলো বেশি দামে বিক্রি করতে বিক্রেতারা বাধ্য হয়। এই চাঁদাবাজি করছে দু'শ্রেণীর মানুষ। সরকারের প্রশ্রয়ে সরকারি দলের লোকজন এবং দুর্বৃত্তরা। দুর্বৃত্ত দমন করা সরকারের দায়িত্ব। আর নিজ দলের লোকজন যে চাঁদাবাজি করবে না, সেটি

নিশ্চিত করাও তার দায়িত্ব। কিন্তু তারা কোনো দায়িত্বই সঠিকভাবে পালন করতে পারছেন না। সুতরাং হয় আপনি নিজে দুর্নীতিতে সাহায্য করছেন অথবা দুর্বৃত্ত দমনে আপনি যে অকার্যকর, সেটি প্রমাণিত হচ্ছে। দুটিই সরকারের জন্য মিসকোয়ালিফিকেশন।

এরপর বলা যায়, আমলাদের কথা। তাদের সম্পর্কে রয়েছে অনেক অভিযোগ। অফিসে ফাইল নড়ে না, কাজ খুব ধীরগতিতে হয়- এ রকম আরো বহু অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু এসব আমলা তথা রাজ কর্মচারীদের এফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভ করার জন্য বা তাদের ইফেক্টিভ করার জন্য র‍্যাডিকেল কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। পুলিশের ক্ষেত্রেও তাই। তাদের কি কি ট্রেনিং দেয়া হয়, সেটি আমি পুরোপুরি জানি না। কিন্তু এটুকু জানি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের যে ট্রেনিং দেবার কথা, সেটি দেয়া হচ্ছে না। সুতরাং তারা সরকারি কর্মকর্তাদের মতোই অকার্যকর বলে প্রমাণিত।

আমি এতোক্ষণ যেসব সমস্যার কথা বললাম সবই বড় বড় সমস্যা। মোটা দাগের সমস্যা। এছাড়া আরও কিছু সমস্যা তো রয়েছেই। যেমন বিদেশী ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করছে না। এ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাও খুব খারাপ। সব মিলিয়ে কোনো অবস্থাতেই সরকারকে কোনো সেক্টরেই পাস নম্বর দেয়া যাচ্ছে না। তারপর তো আর বসে থাকা যায় না। এবার একটু লেখাপড়া করানো উচিত। বুঝলাম আমার সময় এসেছে কিছু করার। এ কারণেই আমি রিঅ্যাক্ট করেছি।

২০০০ : আপনি যে সব কথা বলেছেন, সবই বলছেন নতুন এক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। আপনি তো বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। একই সঙ্গে দলের একজন শুভাকাঙ্ক্ষীও ছিলেন। নতুন প্ল্যাটফর্মে আসার আগে আপনি কি কখনো বিএনপির হাইকমান্ডকে বলার চেষ্টা করেছিলেন যে, দেশের অবস্থাটা এখন এ রকম? এতোটা নাজুক...

বি. চৌধুরী : না, না আমি কেন বলবো? একটি সাধারণ অঙ্ক আপনারা ভুলে যাচ্ছেন। যেদিন আমি প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রার্থী হলাম, সে দিন থেকে আমি বিএনপির কেউ না। আমি দল থেকে পদত্যাগ করেছিলাম। সুতরাং আমার তো কোনো অধিকার নাই বিএনপিকে কিছু বলার। যেদিন থেকে প্রেসিডেন্ট হলাম তখন থেকে তো আমি নিরপেক্ষ এবং সেই নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। তারপর তো বিএনপিকে আমি কিছু বলতে পারি না।

২০০০ : কিন্তু দেশের একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে এবং বিএনপির একসময়ের খুবই ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবেও তো বলতে পারতেন।

বি. চৌধুরী : ভাই, আমি তো একজন সাধারণ মানুষই। সাধারণের একজন হয়েই আমি কথাগুলো বলছি। ২২ নবেম্বরের ভাষণেও আমি বলেছি যে, আমি সুশীল সমাজের একজন সদস্য। সে হিসেবেই কথা বলছি। কিন্তু এখন আমি বলছি যে, সুশীল সমাজ যদি চায়, আমি দল গঠন করবো। সুশীল সমাজের অন্তর্গত সব পেশাজীবীদের সঙ্গে আমি কথা বলছি। তারা চাইলে আমি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করবো, এই

অন্তর্দ্বন্দ্ব যদি হতো, তাহলে প্রথম কথা যে কারণে দ্বন্দ্বটা হয়েছিল, মনে করা হয় যদি আমার পদত্যাগের প্রশ্নে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই রিঅ্যাকশনটা হতো। দ্বিতীয়ত, আমি পরিষ্কার ঘোষণা করতাম বিএনপি ভেঙে আরেকটা বিএনপি করছি। তৃতীয়ত আমি বলতাম বিএনপির প্রোগ্রাম, সংবিধানে যা যা আছে আমি তার সবগুলোতেই একমত। কিন্তু আমি কোনোটাই করি নাই

কথাটাই বলছি।

২০০০ : আপনি দুটি ইনঅ্যাফি-সিয়েন্সির কথা বলেছেন। ব্যুরোক্রেসি, পুলিশ একটা। আরেকটা নিচু পর্যায়ে। মাইক্রো লেভেলে কিছু সন্ত্রাস হয়, যেটা বলছেন সরকার পূর্ণাঙ্গ দায়ী নাও হতে পারে।

বি. চৌধুরী : নাও হতে পারে আমি বলি নাই। সেটা আরেকটু পরিষ্কার করে বলি। আপনি যদি বলেন একটা জায়গায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে জমি নিয়ে। সরকার বলতে পারে, এটা আমার ডাইরেক্ট দায়িত্ব নয়। অন্যান্য সব সন্ত্রাসের দায়িত্বই তো সরাসরি সরকারকে নিতে হবে।

২০০০ : দেশে কোনো কার্যকরী শাসন ব্যবস্থা নেই বলে অনেকে অভিযোগ করেন। আরো পরিষ্কারভাবে বলা যায় পুরো দেশেই কোথাও কোনো গভর্নেন্স নেই। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

বি. চৌধুরী : এ সম্পর্কে আমার স্পষ্ট বক্তব্য আছে। গভর্নেন্স জিনিসটা একটা টোটাল সাবজেক্ট। ব্যুরোক্রেসিকে এফিসিয়েন্ট করা, মন্ত্রীদের এফিসিয়েন্ট করা, দ্রুত কার্যকর পলিসি গ্রহণ করা, রাজনীতিবিদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, দেশে সুস্থধারার রাজনীতির প্রবাহ নিশ্চিত করা, দারিদ্র্য, দূরীকরণ- সবই গভর্নেন্সের অন্তর্ভুক্ত। এর কোনো কোনো অংশে ফেইল করলে আপনার ব্যর্থতা হবে আংশিক। আর টোটাল সিস্টেমে অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে সেটা হবে টোটাল ফেইলিওর ইন গভর্নেন্স। গভর্নেন্স মানে যদি শাসন ধরেন সেটি অন্য কথা। সেটা হবে ইংরেজি শব্দের অনুবাদ মাত্র। সেটাও তো নেই। রাস্তাঘাটে বের হয়েও ছিনতাইয়ের ভয়। আপনার গাড়ি থামিয়ে আপনাকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে। এখন প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই নন-গভর্নেন্স অবস্থা বিরাজ করছে।

২০০০ : এই নন-গভর্নেন্স অবস্থা আপনি ব্যাখ্যা করছেন কিভাবে?

বি. চৌধুরী : আপনি দল কন্ট্রোল করতে পারেন না, দলের লোক কন্ট্রোল করতে পারেন না, মন্ত্রী কন্ট্রোল করতে পারেন না, সরকারি কর্মচারী, সন্ত্রাসী কন্ট্রোল করতে পারেন না, এটাই তো নন-গভর্নেন্স। এই অবস্থা চলতে চলতে আলটিমেটলি কোনো কোনো রাষ্ট্র ফেইল স্টেটে চলে যায়।

২০০০ : এই অবস্থায় আপনি বিকল্প ধারার কথা বলছেন এখন। প্রথমে যেটা ছিল তৃতীয় ধারা...

বি. চৌধুরী : না না, আমরা কখনো থার্ড হই নাই।

২০০০ : জিয়াউর রহমানও কিন্তু প্রবেশ করেছিলেন তৃতীয় ধারা হিসেবেই। মধ্যপন্থি হিসেবে।

বি. চৌধুরী : না, আমি সেভাবে আসি নাই।

২০০০ : বিকল্প বলতে কিন্তু বোঝাতে পারে আপনি প্রচলিত রাজনীতি সম্পর্কেই দ্বিমত পোষণ করছেন!

বি. চৌধুরী : প্রচলিত রাজনীতির বিকল্প কিছু আমরা জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। প্রচলিত রাজনীতিতে আজকে যেটা হচ্ছে, সেটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক।

প্রথমত, প্রচলিত রাজনীতিতে দেশের মেধাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ রাজনীতিবিদরা নেন না। একদমই নেন না। অথচ আমাদের দেশের মেধাবী তরুণরা আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ডে গিয়ে অসাধারণ কাজ করছে। কেউ বা প্রফেসর হয়েছে, কেউ ডাক্তার আবার কেউ বড় ব্যবসায়ী হিসেবে অনেক খ্যাতি কুড়িয়েছে। আমি দেখলাম টাঙ্গাইলের দুইজন ব্যবসায়ী আমেরিকায় দারুণ নাম করছে। আমরা এদের পরামর্শ নেই না। শুধু তাই না, আমাদের অনেক ভালো ভালো সরকারি কর্মচারী আছে। এছাড়া অনেকে জাতিসংঘ, ইউএনডিপির মতো ভালো জায়গায় দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। আমরা তাদের পরামর্শ নেই না। আজ যিনি ক্রীড়ামন্ত্রী, কাল তিনি ধর্মমন্ত্রী, এমনকি পরশু তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়াও বিচিত্র না। তার মানে কি আমরা সবাই সব বিষয়ে সত্যি সমান দক্ষ? আসলে তো সেটা না। রাজনীতিবিদরা মনে করেন তারাই সব বোঝেন। অন্যরা কিছু বোঝে না। এই যে প্রচলিত ধারা, এই ধারাটিই আমরা ভাঙতে চাই। এ জন্যই আমরা সুশীল সমাজের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের নিয়মিত যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে চাই। যেমন : শিক্ষানীতির ব্যাপারে আমরা শিক্ষকদের সঙ্গে কথা

বলবো। ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের ডাকবো। একই সঙ্গে ডাকবো শ্রমিক নেতাদেরও। তাদের কথা শুনবো। তারা যা বলবে সেটাই যে হুবহু অ্যাপ্লাই করবো, এমন নয়। কেননা রাজনীতির দর্শনও থাকতে হবে। তবে সার্বক্ষণিক একটি চ্যানেল মেইনটেইন করবো। এটি হচ্ছে বিকল্প ধারা। অন্য কোনো প্রচলিত রাজনীতিতে এমন ব্যবস্থা নাই।

দ্বিতীয়ত আরেকটি কথা বলা যায়, প্রচলিত রাজনীতিতে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতায় যাওয়া। যে করেই হোক তাদের ক্ষমতায় যেতেই হবে। আমরা সবাইকে বলি, এমনকি আমাদের সাগরেদ ছাত্রদলকেও বলি ক্ষমতায় যাচ্ছি, চিন্তা নাই। আর যেদিন ক্ষমতায় গেলাম তার পরদিন কি হবে। কথাটাই তো ক্ষমতা। ব্যাপারটা কিন্তু দায়িত্ব নয়। এমন নয় যে, দেশের লোক আমাকে ভোট দিয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। তারা মনে করে যে ক্ষমতায় আরোহণ করেছে। কাজেই পরদিনই ছাত্ররা পিস্তল নিয়ে বের হয়, মিনিস্টার সাহেবরা আগে-পিছে লোক নিয়ে চলাফেরা করেন। বিরোধী দলের মিছিল দেখলে বলে মার দিয়ে ঠান্ডা করে দাও। কিছু করার নেই এখানে। কারণ তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়নি। আপনি, আপনারা, ভোটাররা তাদের ক্ষমতা দিয়েছেন। সেই ক্ষমতার প্রয়োগ তারা করছে। আসলে শব্দটা হবে দায়িত্ব। দেশের লোক আমাদের নির্বাচিত করলে আমরা দায়িত্বপ্রাপ্ত হবো, ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়। এটাই প্রচলিত রাজনীতির বিকল্প ধারা। যে মুহূর্তে দেশের লোক বলবে আমরা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি, সে মুহূর্তে দায়িত্ব ছেড়ে দেবো। পদত্যাগ করবো।

তৃতীয়ত, আমরা পরিবর্তন আনতে চাই রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। আমাদের পলিটিক্যাল কালচারে যে দল জিয়াউর রহমানের ভক্ত সে শুধু জিয়াকে ভক্তি করাতেই তার দায়িত্ব শেষ হচ্ছে মনে করে না। একই সঙ্গে চাচ্ছে শেখ মুজিবকে নিচে নামাতে। একইভাবে যে দল শেখ মুজিবের ভক্ত, তারা চাচ্ছে জিয়াকে ডাউন করতে। এ ছাড়াও মওলানা ভাসানী, জেনারেল ওসমানীকেও যথাযথ সম্মান করে না দলগুলো। দেশের এই রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিণাম ভয়াবহ। এতে দেশ বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। দেশের কোনো উপকার এতে হচ্ছে না। এটা তো সঠিক কোনো পথ নয়। আমাদের জাতীয় বীরদের আমরা কেন অশ্রদ্ধা করবো? আমরা যে ধারার কথা বলছি সেখানে এই চারজনকে কোনো রকম অশ্রদ্ধার কোনো সুযোগই থাকবে না। সেটা করে আমরা দেশকে বিভক্ত করতে চাই না। আমরা চাই একতাবদ্ধ বাংলাদেশ।

আমরা এখন বাংলাদেশের প্রধান তিনটি সমস্যা চিহ্নিত করেছি সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দারিদ্র্য। এগুলোকে দূরীকরণের টার্গেট নিয়েই আমরা নতুন প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছি।

২০০০ : এতোক্ষণ আপনি যা বললেন, সেগুলো প্রচলিত ধারার বিপক্ষে আপনার অবস্থান। কিন্তু প্রচলিত ধারার রাজনীতির সঙ্গে আপনি তো বহুদিন খুব ভালোভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। ক্ষমতায় ছিলেন অনেক দিন.....

বি. চৌধুরী : ক্ষমতা নয়, দায়িত্বে। আমি কখনো ক্ষমতা দেখানোর চেষ্টা করিনি।

২০০০ : ধরা যাক, দায়িত্বেই ছিলেন।

> আপনি দল কন্ট্রোল করতে পারেন না, দলের লোক কন্ট্রোল করতে পারেন না, মন্ত্রী কন্ট্রোল করতে পারেন না, সরকারি কর্মচারী, সন্ত্রাসী কন্ট্রোল করতে পারেন না, এটাই তো নন-গভর্নেন্স। এই অবস্থা চলতে চলতে আলটিমেটলি কোনো কোনো রাষ্ট্র ফেইল স্টেটে চলে যায়

আজ আপনি যে কথাগুলো বলছেন, দায়িত্বে থাকাকালীন এগুলোর প্রয়োগ করার চেষ্টা কি করেননি?

বি. চৌধুরী : ভালো প্রশ্ন। কিন্তু আপনার মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের রাজনীতি আর ইংল্যান্ডের রাজনীতি এক না। ইংল্যান্ডে কি হয়? যে দল জিতে ক্ষমতায় যায়, সে দলের শীর্ষনেতা দলীয় প্রধান পদে বহাল থাকবেন। কিন্তু যে দল হারবে, তার দলনেতা পদত্যাগ করেন। যে নির্বাচনে লেবার পার্টি রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে পারেন না, সে নির্বাচনের পর লেবার পার্টির প্রধান পদত্যাগ করেন। কনজারভেটিভ পার্টির ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু আমাদের এখানে কি হয়? ইনশাল্লাহ ইন্তেকাল না হওয়া পর্যন্ত কেউ যায় না। সমস্ত পলিটিক্স তাকে ঘিরেই হয়, তার ফেভার লাভ করার জন্য। আমি পাঁচটা ভালো কথা বললেও যদি তাকে স্যুট না করে, সেটা গ্রহণ করবে কি করবে না তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা। আমার এখতিয়ারে থাকে না। সুতরাং আমি অ্যাডভাইস করি নাই যে তা আপনি জানেন না।

২০০০ : সেটাই জানতে চাচ্ছি...

বি. চৌধুরী : অ্যাডভাইসটা গ্রহণের ব্যাপার তার একান্তই নিজস্ব ব্যাপার এখানে। নিয়মই তাই হয়ে গেছে। সব সময়ই তাই হয়। এটা শুধু বিএনপির ব্যাপার নয়। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি সব জায়গাতেই একটা লোকই সর্বেসর্বা। সে জন্য রাজনীতি আগায় না। মুক্ত বাতাস আসে না। আমরা এই ধারা পরিবর্তনের পক্ষপাতি। আমাদের দলীয় নীতিতে এমন ধারা রাখবো যাতে পার্টির চেয়ারম্যানকে নির্বাচিত হয়ে আসতে হয়।

২০০০ : এখনকার দলগুলোতেও কিন্তু নেতা নির্বাচনের বিধি রয়েছে।

বি. চৌধুরী : না, কোনো কিছুই লেখা নেই। লেখা আছে ২ বার নেতা নির্বাচন করা হবে। আর করা হয় ৭ বছর পর।

২০০০ : আমাদের এখানে রাজনীতির যে চিত্র তা মাস্তান অধ্যুষিত ও কালো টাকার নির্বাচন। এ জায়গায় আপনি কিভাবে আশান্বিত হচ্ছেন?

বি. চৌধুরী : এ বিষয়টা আমিও চিন্তা করেছি। আশার আলো দেখি যখন দেখি দল থেকে চলে গিয়েছিলেন এমন লোকরা আবার রাজনীতিতে ফিরে এসে ভালো করেছিলেন। যেমন ভুট্টো, ভারতের দেশাই। এদের দেখলে আমার মনে আশা হয়। বড় বড় দেশে এরা ঠিকই ফিরতে পেরেছিল। পরে ম্যানেজ করতে পারে নাই সেটা অন্য বিষয়।

দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় আছে- বাংলাদেশের মানুষ শেষ পর্যন্ত প্রায় ভুল করে না। একেবারে পাকিস্তান আমল থেকেই এর শুরু। প্রতিটি নির্বাচনেই তারা যে রায় দেয়, সেটা একেবারেই ফেলে দেবার মতো নয়। তো যে বিকল্প ধারার কথা আমরা বলছি সেটা যদি জনগণকে বোঝাতে না পারি, তাহলে সেটা আমাদের ব্যর্থতা। বোঝাতে পারলে জনগণ আমাদের বেছে নেবে বলেই আমার বিশ্বাস। অবশ্যই সন্ত্রাস, কালো টাকার প্রভাব এগুলোরও একটা প্রভাব পড়ে রাজনীতিতে। কিন্তু নিরপেক্ষ সরকার এলে দেশ অনেক ভালোভাবে চলে। খেয়াল করে দেখবেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিন মাস দেশের মানুষ অনেক শান্তিতে ঘুমাতে পারে। এ সময় সন্ত্রাস আর কালো টাকা খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারবে না। এটাও আমার একটা পয়েন্ট। সুশীল সমাজ দিয়ে দেশ চালালে তার ফলাফল যে ভালো সেটার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তো তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

২০০০ : আপনি কি তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে মডেল হিসেবে ধরছেন?

বি. চৌধুরী : না, না সেটা কেন? রাজনীতি থাকতে হবে তো। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তো রাজনৈতিক দর্শন নেই। দেশ চালাতে হলে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

২০০০ : প্রশাসনকে তো সেভাবে চালাতে পারেন?

বি. চৌধুরী : হ্যাঁ সেটি পারি। সেটা করা যায়।

২০০০ : সেটার জন্য তো আপনাকে ক্ষমতায়..

বি. চৌধুরী : হ্যাঁ ক্ষমতায় যেতে হবে।

২০০০ : সেই পরিস্থিতি আছে কি?

বি. চৌধুরী : আসল পরিস্থিতি বুঝতে হলে সেই তিন মাসে যেতে হবে। এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার আগের পরিস্থিতি যেটা সেটা নির্ভর করে এই সরকার পদত্যাগ করে কি করে না তার ওপর। এরা যতদিন আছে, ততদিন তো ক্ষমতায় আছে, দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়।

২০০০ : বর্তমানে আওয়ামী লীগ বড় ধরনের আন্দোলনের দিকে যাচ্ছে। সরকারবিরোধী বেশ বড় মোর্চা গঠন করছে। আপনি বর্তমান সরকারকে ব্যর্থ বলছেন। এই সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করাতে সবচেয়ে সহজ পন্থা হিসেবে আপনি আওয়ামী লীগকে সমর্থন করতে পারেন, তাই না?

বি. চৌধুরী : আমি যদিও এখন পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করিনি, তবুও একটি কথা এখনই স্পষ্ট করে বলতে চাই। এই সরকারকে পদত্যাগ করানোর জন্য যারাই আন্দোলন করবে, তাদেরকে আমি সমর্থন দিবই তো। সোজা কথা এটা। যারাই করুক, সমর্থন দেব। তবে এটা কি পদ্ধতিতে হবে সেটা অন্য কথা। '৯০ সালেও বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী যার যার প্ল্যাটফর্মে থেকে এরশাদবিরোধী আন্দোলন করে। যদিও তাদের মতাদর্শ এক নয়। যুগপৎ আন্দোলন করেছিল সবাই। সুতরাং স্কোপ অনেক আছে। অমুককে সাপোর্ট না করলে সরকারকে সাপোর্ট করা হবে সে রকম হওয়ার তো দরকার নেই।

২০০০ : আপনি সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দারিদ্র্যকে প্রধান টার্গেট করেছেন। বিএনপি, আওয়ামী লীগও কিন্তু এই ইস্যুগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে বক্তব্য দিচ্ছে। কিন্তু এতে সমস্যা কমছে না। সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দারিদ্র্য দূরীকরণে আপনার কি সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা বা প্রস্তাব আছে, যা প্রয়োগ করলে আপনি সফল হবেন বলে মনে করেন?

বি. চৌধুরী : সম্প্রতি আমার লেখা একটি বই 'যেমন বাংলাদেশ চেয়েছিলাম' বেরিয়েছে। সেখানে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে আমি একটা ধারণা দিতে চেষ্টা করেছি। যেমন মন্ত্রী, এমপি যেসব রাজনৈতিক দলের নেতাদের সংসদে প্রতিনিধিত্ব থাকবে, তাদের জেলা পর্যায়ে প্রতি বছর একবার করে আর্থিক অবস্থানের স্টেটম্যান দিতে হবে। নিজের, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের। এই বিবৃতি থেকে জনগণ জানতে পারবে যে তার অর্থনৈতিক অবস্থা এখন কেমন। সে কতো টাকার মালিক। পরের বছর আবার বিবৃতি দিলে জনগণ বুঝবে এক বছরে তার সম্পদ কতো বেড়েছে। সে যেন ভুল বিবৃতি দিতে না পারে। সে জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের সদস্যরা সেটা ক্রস চেক করতে পারবেন। এটা গেল একটা উদাহরণ। তেমনি ঢাকার মতো বড় বড় শহরে যাদের বাড়ি আছে, যাদের সম্পদের পরিমাণ তাদের একটি বাৎসরিক বিবৃতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ব্যুরোক্র্যাট লেভেলে এমন স্টেটমেন্টের ব্যবস্থা করা যায়।

সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে একটা কথা বলা যায়। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র রাজনীতির বাহকরাই অনেক ক্ষেত্রে সন্ত্রাস করেন। কারণ যারা ছাত্র রাজনীতি করেন, তাদের বেশির ভাগই ছাত্র না। প্রকৃত ছাত্ররা এমন করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক ছাত্র সংগঠন বাদ দিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক ছাত্রদের রাজনৈতিক পরিচয় জরুরি। অমুক ওয়ার্ডের ছাত্রদল নেতা কেন হবে? দেখা গেলো সেই ওয়ার্ডে কোনো কলেজই নেই। ছাত্রদের রাজনৈতিক দল হবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল, ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগ- এমন হবে। মানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক ছাত্ররাজনীতি হতে হবে। এটা আমাদের আরেকটি প্রস্তাব।

এছাড়া আরো বলা যায়, পুলিশের কথা। তারা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ, সেটা ঠিক। কিন্তু কেন ব্যর্থ হচ্ছে। সেটি কি খুঁজে দেখেছি? তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না, সন্ত্রাসীদের মোকাবেলায় তাদের কাছে নেই কোনো অস্ত্র, নেই জীবনের নিরাপত্তা- তাহলে তারা কিভাবে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করবে। পুলিশকে যথাযথ ট্রেইন্ডআপ করতে হবে। তাদের পরিবারের নিরাপত্তা দিতে হবে। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হবে। পুলিশের সন্তানদের জন্য আলাদা পুলিশ স্কুল থাকতে হবে। সন্তানের লেখাপড়ার জন্য হয়তো তার বেতন থেকে ১% কেটে নেয়া হতে পারে। একইভাবে তার নিশ্চিত বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এখন যেমন বাড়ি ভাড়ার জন্য বেতনের ৭.৫% কাটা হয়, তখন হয়তো ২০% কাটা যেতে পারে। পুলিশ সদস্যরাও এতে আপত্তি করবে না যখন তারা জানবে ১৫ বা ২০ বছর পর তারা ঐ ফ্ল্যাটের মালিক হবে। এগুলো করতে পারলে কর্মক্ষেত্রে সে অনেক বেশি কার্যকর হিসেবে পরিগণিত হবে।

এরকম আরো অনেক পরিকল্পনা আছে। দেশের পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি করতে হবে। ৬৪ জেলার ৬৪টি স্কুলকে বেছে নেয়া যেতে পারে। যেখান থেকে দেশের আগামী দিনের রাজনীতিবিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বেরিয়ে আসবে। এই প্রকল্পটির বাজেট হতে পারে এক হাজার কোটি টাকা। ঐ স্কুলগুলোর শিক্ষকরাও হবে বিশেষভাবে ট্রেইন্ড। আমরা ৪০ হাজার কোটি টাকার বাজেট করি বছরে। আপনি এমন কাজের জন্য আমাকে এক হাজার কোটি টাকা দেবেন না? ন্যাশন বানিয়ে দেব ৫ বছরে।

২০০০ : এগুলো তো আপনার বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা। দেশ চালানোর সময় এগুলো প্রয়োগ করবেন। কিন্তু ক্ষমতায় যাবেন কিভাবে?

বি. চৌধুরী : হ্যাঁ, সেটাই। আমি যদি আমার পরিকল্পনার কথা না জানাই, তাহলে জনগণ কিভাবে বুঝবে যে আমি আলাদা? আমার রাজনৈতিক দল আলাদা? তারা কেন আমাকে ভোট দেবে? এমন পরিকল্পনার কথা শুনেই তো দেবে। এরপর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে আমরা যদি সততার সঙ্গে তা না করি। তাহলে তারাই আবার আমাদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেবে। দেশের প্রয়োজনে আমরা যাদের সঙ্গে মিলেমিশে নির্বাচন করবো তারা যদি এই পয়েন্টগুলোতে একমত হয় তাহলে এই প্রোগ্রামগুলো বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু শুধু তথাকথিত ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আমি রাজনীতি করতে রাজি না।

২০০০ : আপনি যখন পদত্যাগ করেছেন, তখন বলেছেন জনগণ চাইলে আবার ফিরে আসবেন। এখন রাজনীতিতে ফিরে আসছেন আপনি। অর্থাৎ জনগণ আপনাকে চাচ্ছে বলে মনে করছেন। কি অবস্থার প্রেক্ষাপটে আপনি এমন মূল্যায়ন করলেন যে জনগণ আপনাকে চাচ্ছে?

বি. চৌধুরী : জনগণ তো কখনো বলে না আপনি রাজনীতিতে আসেন। কিংবা বলে না সভাপতি হয়ে নতুন দল গঠন করেন। বলে যে দেশের এই অবস্থায় আপনি কি করছেন? দেশের অবস্থা কি দেখেন না? কিছু করছেন না, করবেন না?

২০০০ : আপনি তো কিছু জরিপ কার্যক্রমও চালিয়েছেন। কি বোঝার জন্য জরিপ করেছেন?

বি. চৌধুরী : অনেক কিছু বোঝার জন্য। জরিপগুলো থেকে আমি বোঝার চেষ্টা করেছি যে জনগণ আসলে কি চায়। বর্তমান সরকারের দেশ পরিচালনার ব্যাপারে তারা কি ভাবছে সেটাও বোঝার চেষ্টা করেছি। জনগণ কি এ রকম অবস্থাই চায়, না পরিবর্তন চায়, সেটাও বোঝার চেষ্টা করেছি।

২০০০ : জরিপের ফাইন্ডিংসটা কি?

বি. চৌধুরী : মূল যে ফাইন্ডিংস সেটা

আমাদের এখানে কি হয়? ইনশাল্লাহ ইন্তেকাল না হওয়া পর্যন্ত কেউ যায় না। সমস্ত পলিটিক্স তাকে ঘিরেই হয়, তার ফেভার লাভ করার জন্য। আমি পাঁচটা ভালো কথা বললেও যদি তাকে স্যুট না করে, সেটা গ্রহণ করবে কি করবে না তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা। আমার এখতিয়ারে থাকে না। সুতরাং আমি অ্যাডভাইস করি নাই যে তা আপনি জানেন না।

> আমি যদিও এখন পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করিনি, তবুও একটি কথা এখনই স্পষ্ট করে বলতে চাই। এই সরকারকে পদত্যাগ করানোর জন্য যারাই আন্দোলন করবে, তাদেরকে আমি সমর্থন দিবই তো। সোজা কথা এটা। যারাই করুক, সমর্থন দেব। তবে এটা কি পদ্ধতিতে হবে সেটা অন্য কথা

হলো সরকারের জনপ্রিয়তা খুব দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। সরকারের একজন প্রভাবশালী, ক্ষমতাশালী মন্ত্রীর এলাকায় জরিপ করেছিলাম। এলাকায় তার জনসমর্থন ছিল ৪৫%। এখন সেটা কমে ২৭%-এ দাঁড়িয়েছে। পার্থক্যটা কিন্তু ব্যাপক।

বিভিন্ন জায়গায় আমরা এ রকম জরিপ করেছি। লক্ষ্য করে দেখেছি শিক্ষক, ছাত্ররা খুবই সচেতন। তারা সবই বোঝে। কিন্তু সাধারণ কৃষকরা এসব কিছু বোঝে না। তারা বোঝে জিনিসের দাম বাড়ছে। খাইতে পাই না।

২০০০ : আপনি কি মন্ত্রীদের এলাকাতেই জরিপ করেছেন?

বি. চৌধুরী : আরে না। উদাহরণ দেবার জন্যই বললাম। আমরা পুরো বাংলাদেশে জরিপ কার্যক্রম চালাচ্ছি। কাজ শেষ হয়নি। এখনো চলছে। পরিসংখ্যানবিদদের সাহায্য নিয়েই করছি। আমরা একটু বৈজ্ঞানিকভাবে আগাচ্ছি।

২০০০ : রাজনৈতিক দল গঠনের আগে আপনি একটি নাগরিক কমিটি গঠনের কথা বলছেন। সেটি কি রকম?

বি. চৌধুরী : কেন্দ্রীয় কমিটি বলেন কিংবা বিকল্প ধারার কমিটি এই রকম কিছু।

২০০০ : সেটি কবে নাগাদ করছেন?

বি. চৌধুরী : খুব শিগগিরই। ৯ মার্চ পল্টন ময়দানে নাগরিক কমিটি ঘোষণা করা হবে।

২০০০ : কমিটির কাঠামো কেমন হবে?

বি. চৌধুরী : একজন আহ্বায়ক, একজন সেক্রেটারি থাকবেন। বাকিরা সদস্য।

২০০০ : কনভেনর তো আপনিই হচ্ছেন?

বি. চৌধুরী : আমরা যাদের সঙ্গে পরামর্শ করছি, তারা যদি এ রকম মতামত দেন, তবে তাই হবে।

২০০০ : যাদের নিয়ে দল গঠন করছেন, তারা সবাই কি রাজনীতিবিদ?

বি. চৌধুরী : না, তা কেন? বিভিন্ন পেশাজীবীর সমন্বয় ঘটবে আমার দলে। তবে এদের মধ্যে কিছু রাজনীতিবিদ তো নিশ্চয়ই থাকবেন।

২০০০ : আপনার মতো যারা দীর্ঘদিন রাজনীতি করছেন, তাদের কারো কারো সঙ্গে তো আপনি যোগাযোগ করছেন। যেমন ড. কামাল।

বি. চৌধুরী : হ্যাঁ, ড. কামালের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে। তবে ওনার তো পৃথক রাজনৈতিক দল আছে। নির্বাচনে হয়তো একসঙ্গে কাজ করতে পারি।

২০০০ : নাগরিক কমিটি করার কতদিন পর রাজনৈতিক দল গঠন করবেন?

বি. চৌধুরী : এই কমিটিকে আগে বেসিক কাজগুলো শেষ করতে হবে। পার্টি কিভাবে পরিচালিত হবে, সেটি ঠিক করবে এই কমিটি। এ রকম আরো কিছু কাজ আছে। এগুলো শেষ হলেই দল গঠনের ঘোষণা দেব। যাতে আমরা আনপ্রিপেয়ার অবস্থায় না নামি।

২০০০ : আগামী ৩ মাসের মধ্যে কি সে রকম কোনো সম্ভাবনা আছে?

বি. চৌধুরী : আই হোপ সো। ভেরি মাচ।

২০০০ : দলের নাম ঠিক করেছেন?

বি. চৌধুরী : এখন পর্যন্ত না। আমরা খুব সহজ একটি নাম খুঁজছি। যেটা সাধারণ মানুষ বুঝবে। 'গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ' টাইপের কোনো নাম হবে না। সহজ, সবার বোধগম্য একটি নামই আমরা খুঁজছি।

২০০০ : বলা হচ্ছে, আপনি রাজনৈতিক দল গঠন করলে রাজনীতিবিদদের জন্য সেটা বার্গেনিং পয়েন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে। যেমন কোনো রাজনৈতিক নেতা বলতে পারেন যে, 'বিএনপি আমাকে নমিনেশন না দিলে আমি বিকল্প ধারায় চলে যাব।' এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

বি. চৌধুরী : হতে পারে। এ রকম হওয়া খুব অস্বাভাবিক কিছু না। তবে ব্যাপারটা যেহেতু অনেক দূরের ব্যাপার, তাই এই ইস্যুটাকে টেনে না আনাই ভালো।

২০০০ : প্রচলিত ধারার রাজনীতিতে অনেক গডফাদার আছে। তারাও যদি আপনার দলে আসতে চায়, তাহলে আপনি কি করবেন?

বি. চৌধুরী : এটা হচ্ছে নীতির প্রশ্ন। নৈতিকভাবেই আমি একজন সন্ত্রাসী, গডফাদারকে আমার দলে নিতে পারি না। নেবও না।

২০০০ : এমন কথা তো আওয়ামী লীগ, বিএনপিও বলে। কিন্তু তাদের দলের সন্ত্রাসীকে তারা সন্ত্রাসী বলে না...

বি. চৌধুরী : আমি পরিষ্কার বলতে চাই, আমি কোনো সন্ত্রাসী নেব না। এটা নীতির প্রশ্ন।

২০০০ : কোনো ঋণখেলাপিকে কি দলে নেবেন?

বি. চৌধুরী : ঋণখেলাপি তো দুই ধরনের হয়। ইচ্ছাকৃত আর অনিচ্ছাকৃত। দুর্নীতিবাজ ঋণখেলাপিদের নেব না। ব্যাংককাররা আরো স্পষ্টভাবে বলতে পারবে।

২০০০ : আপনার দলের গঠনতন্ত্রে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু থাকবে কি?

বি. চৌধুরী : গঠনতন্ত্র তৈরি হবার পর বলতে পারবো।

২০০০ : দল গঠনে বারবার আপনি সুশীল সমাজের অংশগ্রহণের কথা বলছেন। বাংলাদেশের বর্তমানে যে সুশীল সমাজ নেতৃত্বে রয়েছে, সেটা শিক্ষকদের কথা বলেন কিংবা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারদের কথাই বলেন, এরা পুরোপুরিভাবে রাজনীতিতে দ্বিধাবিভক্ত...

বি. চৌধুরী : না, সবাই রাজনীতিতে যুক্ত নয়।

২০০০ : নেতৃত্বের সবাই কোনো না কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত। আর যারা রাজনীতিতে ইন্টারেস্টেড না, তাদেরকেই বা কিভাবে আপনি আপনার দলে সম্পৃক্ত করবেন? কেননা শেষ পর্যন্ত তো আপনিও রাজনৈতিক দল গঠন করছেন।

বি. চৌধুরী : রাজনীতিতে তারা আসবে আমি এটা কখনোই বলি নাই। আমি বলেছি দেশ গঠন ইস্যুতে প্রতিনিয়ত সুশীল সমাজের সঙ্গে মত আদান-প্রদান করব। আমি বললেই যে তাদের আমার দলে আসতে হবে এমনটা নয়। এ ব্যবস্থা বিদেশের অনেক পার্টিতেই আছে। এমনকি জর্জ বুশেরও আছে। শুধু একটা কমিটি না, যতগুলো মন্ত্রিসভা ততোগুলো কমিটি আছে। তারা বিভিন্ন মন্ত্রীকে পর্যবেক্ষণ করে। এরপর সে অনুযায়ী নিজেদের মতামত দেয়। প্রত্যেকের যে সরাসরি রাজনীতিতে জড়িত হতে হবে, এমন নয়। এভাবেও সরকার সুশীল সমাজের সঙ্গে মতামত আদান-প্রদান করতে পারে।

২০০০ : এই যে সুশীল সমাজের কথা বলছেন, গণতন্ত্রকে সংক্ষেপকরণ করছেন। কেন সমগ্র জনগোষ্ঠীকে টার্গেট অডিয়েন্স করছেন না? সুশীল সমাজ তো কোনো কিছু নিয়ন্ত্রণও করতে পারে না। সুশীল সমাজের ব্যর্থতা কিন্তু একটি কারণ তো দেশের এই অবস্থার জন্য।

বি. চৌধুরী : হ্যাঁ, সত্যিই। এই জন্য আমি সুশীল সমাজকে বলেছি আপনারা চুপ কেন?

২০০০ : বারবার সুশীল সমাজের কথা বলছেন কেন?

বি. চৌধুরী : বলছি এ জন্য যে, এই সুশীল সমাজ তো আর আকাশ থেকে আসেনি। এ দেশের সুশীল সমাজ নিম্ন-মধ্যবিত্তের ভেতর থেকে উঠে এসেছে। দারিদ্র্যের ভেতর থেকে উঠে এসেছে। কাজেই তাদের 'নাড়ির টান' রয়েছে।

আমাদের দেশে খুব কম লোকই আছে, যাদের এক জেনারেশন কিংবা দুই জেনারেশন আগের পুরুষরা কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না। আমার দাদা গ্রামে ছিল। বাবা গ্রামে লেখাপড়া করেছে। তারপর সেখান থেকে উঠে এসেছে। কাজেই আমাদের রুটটা তো খুব দূরে না। এই সুশীল সমাজ সব সময় দেশের প্রয়োজনে সাড়া দিয়েছে। সেটা '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বলুন কিংবা তার আগের আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের কথা বলুন না কেন? সে জন্যই আমি আশাবাদী। দেশের এই সংকটকালে তারা আমার পাশে দাঁড়াবেন। তিন মাসের অভিজ্ঞতায় আমি বলবো আমার অঙ্ক ভুল হয়নি। সুশীল সমাজের কাছ থেকে আমি ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। কারও কারও কাছ থেকে হয়তো বেশি। আবার কারও কারও কাছ থেকে কম। তারা সবাই রাজনীতির বাইরে থেকে দেশের উন্নয়নের অংশীদার হতে চায়।

২০০০ : নিরপেক্ষ সুশীল সমাজের সদস্য কিভাবে খুঁজে বের করবেন?

বি. চৌধুরী : আমাকে কিন্তু এদের খুঁজে বের করতে হবে না। কারণ আমার কাছে অনেক অনেক লোক আসে-যায়। কেউ হয়তো একবার এসে আর আসেননি। কিন্তু অনেকেই এসেছেন। ৫ বার, ৭ বার, ১০ বার এসেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে আমার সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। এতেই বোঝা যায়, আমরা ভালো একদল লোক পাবো। যারা সরাসরি রাজনীতি করতে চান না। কিন্তু দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে চান। এদেরই আমরা খুঁজছি। এদের পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট কম, দেশের উন্নয়নে ইন্টারেস্ট বেশি। আপনি যদি নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হন, তাহলে চাইলেও দলের বিরুদ্ধে অনেক কথা আপনি বলতে পারেন না। অনেক কথা আধাআধি বলতে হয়। অভিজ্ঞতা থেকেই আমি এটা দেখেছি।

২০০০ : বাংলাদেশ একটি ছোট্ট দেশ। কিন্তু এর জনসংখ্যা ব্যাপক। প্রায় ১৫ কোটি মানুষকে ইমপ্রেস করার মতো পর্যায়ে যাওয়া কি এতোটাই সহজ?

বি. চৌধুরী : খুব কঠিন। খুবই কঠিন। ব্যাপারটা মোটেই সহজ না। তবে কিছু কিছু কারণে আমি আশাবাদী। একটি পার্টি পুরোপুরি গঠন করার প্রক্রিয়ায় আমি ছিলাম। সেখানে আমার কিছু অবদানও আছে। এছাড়া বাংলাদেশের প্রায় ৯৫ ভাগ থানায় আমি গেছি। কাজেই আমার একটি পরিচিতি আছে।

বাংলাদেশের রাজনীতির সবচেয়ে বড় যে দুটো দুষ্টক্ষত রয়েছে সেটা হলো সন্ত্রাস ও দুর্নীতি। এই দুটো দুষ্টক্ষত আমাকে ছুঁতে পারেনি বলেই সাধারণের বিশ্বাস। এতে আমার একটা গুডউইল তৈরি হয়েছে।

এছাড়া আমি কখনো অতি আক্রমণাত্মক হইনি। কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা নেতাকে হুমকি-ধামকি দেইনি। জেনেশুনে কারো কোনো ক্ষতি করিনি। এসব মিলিয়ে মনে হয়, আমার একটা ভালো ব্যক্তিগত ইমেজ জনসাধারণের মধ্যে রয়েছে। এই ইমেজ নিয়ে দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক ধারা পাল্টে দেবার আশা আমি করতেই পারি। আর দেশের আপামর জনগণের কথা যেটা বললেন, জনমত কিন্তু খুব সহজেই পাল্টে যায়, যেতে পারে। নির্বাচনের আগের এক মাসেই দেখেন না কিভাবে জনমত ঘুরে যায়। আমি তাই আশাবাদী। খুবই আশাবাদী।

তবে এ ক্ষেত্রেও প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটানোর পক্ষপাতি আমি। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নির্বাচনে এখন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যবহার করতে হবে। টেলিভিশন, সিডি, ক্যাসেটের ব্যবহার করতে হবে। এ রকম বিভিন্ন মেকানিজম আছে। সেগুলোর প্রয়োগ করতে হবে।

গত নির্বাচনে আমি 'সাবাস বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানটি নির্মাণ করেছিলাম। জনগণ সেটি গ্রহণ করেছে। নতুন এই মেকানিজম জনমত পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। এটি যে এক কার্যকর মেকানিজম, সেটি বোঝা যায় যখন ৩ দিনের মাথায় আওয়ামী লীগ একই রকম প্রোগ্রাম নিয়ে টিভিতে হাজির হলো। ৪ দিনের দিন জাতীয় পার্টি, ৫ দিনের দিন জামায়াতে ইসলামী টিভিতে চলে এলো। অর্থাৎ জনগণের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। উন্নত বিশ্বে নির্বাচন তো হয় টিভিতে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপানে টিভিতে প্রচারিত প্রোগ্রামের ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারণ হয় কোন দল দায়িত্বে যাবে। অথচ আমরা পড়ে আছি মান্ধাতা আমলের সিস্টেমে। নির্বাচনে তথ্যপ্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার ঘটাচ্ছি। আমরা এই ব্যবস্থারও পরিবর্তন আনতে চাই। ১৫ কোটি মানুষের কাছে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হয়, সেটি আমরা জানি। আমরা শুধু সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছি। আমিও জানি ওল্ড স্টাইলে নো চান্স। কিন্তু যদি মডার্ন স্টাইলে অ্যাপ্রোচ করা যায়, যদি নিরপেক্ষ সরকার আমাদের সেই সুযোগ দেয়, তাহলে ৩ মাসের ভেতর জনমতের পরিবর্তন ঘটানো খুবই সম্ভব। ঘরে ঘরে অ্যাপ্রোচ হয়ে যাবে, ইনশাল্লাহ দেখে নেব তখন।

২০০০ : সংসদ নির্বাচনে কি ৩০০ আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন?

বি. চৌধুরী : করলে কি আর অর্ধেক করবো? এখন তো বলতে পারি না। যুক্তফ্রন্ট হলে আমরা কতো ভাগ পাই।

২০০০ : নির্বাচনে কি তাহলে যুক্তফ্রন্ট হিসেবে অংশগ্রহণ করছেন?

বি. চৌধুরী : সেটি এখনো বলা যাচ্ছে না। পরিবেশ পরিস্থিতি সেটি নির্ধারণ করবে। আমরা আমাদের প্রস্তাবগুলো সমমনা দলগুলোর সামনে উপস্থাপন করবো। সেগুলোতে তারা যদি ঐকমত্য পোষণ করে তাহলেই যুক্তফ্রন্টে নির্বাচন করা যেতে পারে। তবে সেটা অনেক পরের ব্যাপার। আমরা আপাতত দলকে শক্তিশালী করার কথা ভাবছি।

২০০০ : জনগণের একটা অদ্ভুত সাইকোলজি আছে যে, আমার ভোট আমি পচাবো না। যে জিতবে না, তাকে ভোট দেব না। ডাক্তার সাহেবকে ভোট দিলে আমার ভোট পচে যেতে পারে- জনগণকে এই সাইকোলজি থেকে উত্তরণের উপায় কি?

বি. চৌধুরী : আপনার কথার সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত। কিন্তু একই সঙ্গে আরেকটা ব্যাপার আপনাকে খেয়াল করতে হবে। ২০০১ সালের নির্বাচনে ভোটারদের শতকরা ৩০ জনের ধারণা ছিল বিএনপিকে ভোট দিলে ভোট পচে যাবে। কিন্তু তাতে কি লাভ হলো? বিএনপি তো ঠিকই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করলো।

২০০০ : বর্তমান পরিস্থিতিতে ধরা যাক, বিএনপি ২৫% ভোট কমান্ড করে। এর সঙ্গে যুক্ত করুন জামায়াতের ১৫-২০% ভোট। তখন তো তারা.....

বি. চৌধুরী : জামায়াত কিন্তু শেষ নির্বাচনে ৪.৫% ভোট পেয়েছে। বিএনপি পেয়েছে ৩৮% এর কিছু বেশি ভোট। আর আওয়ামী লীগের ভোট ছিল ৪৩%।

২০০০ : সেটা ঠিক আছে। কিন্তু আসন বন্টন হয়েছে এমনভাবে যাতে বিএনপি-জামায়াত সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েই সরকার গঠন করেছে। ভোটের হিসাবে জামায়াতের ভোট খুব কম মনে হচ্ছে। আসলে কিন্তু সেটা নয়। এই সময়ে বর্তমান সরকারে থেকে জামায়াত কিন্তু নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছে। গ্রামেগঞ্জে পার্টির কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। যেটা বিএনপি হয়তো বুঝতে পারছে না।

বি. চৌধুরী : জামায়াতের কথা তো বলছেন? সঠিক, খুবই সঠিক।

২০০০ : বিএনপি-জামায়াত এই জোট ভবিষ্যতে অন্যদিকে মোড় নিতে পারে।

মনে রাখতে হবে এখানে আমার দুটি সত্তা। একজন পিতা, অন্যজন রাজনীতিবিদ। বাবা হিসেবে আমি বলবো তুমি ওদের সঙ্গে থেকো না। কেননা দলটি সন্ত্রাস ও দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে, পচে গেছে। কিন্তু একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে আমি বলবো যে, ইউ হ্যাভ ইউর চয়েস

হয়তো ব্রুটাল ফোর্স হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। এ বিষয়ে আপনারা কি ভাবছেন?

বি. চৌধুরী : এখানে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে। জামায়াতে ইসলামী এ দেশের কোনো দল নয়। এটি আন্তর্জাতিক দল। দলটির একটি শাখা হচ্ছে বাংলাদেশের এই জামায়াতে ইসলামী। এ দেশের গ্রামের অধিকাংশ জনগণই ধর্মপ্রাণ। কিন্তু তারাও জামায়াতের কার্যক্রমে কনফিউজড। রাষ্ট্রক্ষমতায় সে জামায়াতে ইসলামীকেই যে চায়, সেটি মনে করার কোনো কারণ নাই। এ দেশের আরও কিছু ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল আছে। তারা জামায়াতের কার্যক্রমের তীব্র বিরোধী। নির্বাচনে আমরা এদের সাহায্য নিতে পারি। জামায়াতকে নিউট্রালাইজ করার জন্য এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

***২০০০ :** বর্তমান রাজনৈতিক ধারায় অসহিষ্ণুতার প্রকোপ অত্যধিক। প্রতিটি রাজনৈতিক কার্যক্রমে অসহিষ্ণুতা কাজ করে। হরতালে এই অসহিষ্ণুতা বাড়ে। আন্দোলন কর্মসূচিতে অসহিষ্ণুতা পরিহার করতে আপনি কোন কোন ধরনের কার্যক্রম অনুসরণ করবেন?*

বি. চৌধুরী : অনেক রকম শান্তিপূর্ণ কার্যক্রম রয়েছে যেগুলো জনগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্য। যেমন অনশন ধর্মঘট। এই পদক্ষেপ অতীতে বিএনপিও নিয়েছে।

আওয়ামী লীগও নিয়েছে। এছাড়া আরো নানাভাবে প্রতিবাদ করা যেতে পারে। যেমন, সন্ধ্যা ৭টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত বাতি নিভিয়ে প্রতিবাদ জানানো যায়। দু'ঘন্টা কর্মবিরতি দিয়ে প্রতিবাদ জানাতে পারেন। মানববন্ধন তৈরি করতে পারেন। এ রকম আরো নানা শান্তিপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

***২০০০ :** তার মানে আপনি হরতাল সমর্থন করেন না?*

বি. চৌধুরী : করি, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হবে। কিন্তু হরতালের নামে গাড়ি জ্বালিয়ে দেবেন, দেশের উৎপাদন

Without understanding they must have wanted to committed suiside. And that's what they have done. Sorry.

ব্যাহত করবেন, সেটা তো মেনে নেয়া যায় না। কিন্তু আমি বলিনি যে আমি হরতাল সমর্থন করি না। সমর্থন করি। বেশ কয়েক দিন হরতাল পালন করলাম না। প্রতিবাদ সন্ধ্যা করলাম। এক মাইলব্যাপী মানববন্ধন করলাম। কিন্তু ৫টা গাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া কি কোনো কাজের কথা? এগুলো আমাদের আবার পয়সা খরচ করে কিনতে হবে না?

***২০০০ :** নির্বাচনে বিশেষ করে ঢাকার আসনগুলোতে প্রতিটিতে নির্বাচনী খরচ তো কোটি টাকার ওপরে। আপনি বলেছেন যে সন্ত্রাস, দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবেন না। তাহলে এই নির্বাচনী ব্যয়কে কিভাবে সামাল দেবেন?*

বি. চৌধুরী : এটা খুব কঠিন প্রশ্ন। আবার এক অর্থে সোজা প্রশ্নও। আমি বলছি, ভাই তুমি যদি আমাকে সমর্থন করো তাহলে আমাকে ভোট দেবে। দেবে না কেন? নিশ্চয়ই দেবে। ৫০ কিংবা ১০০ টাকার জন্য নিজের কপাল নিজে কেন খুঁড়বে। এটা যদি জনগণকে বোঝাতে পারি তাহলে অবশ্যই

ভোট পাব। তবে এটাও ঠিক এখন আর নির্ধারিত ৫ লাখ টাকার মধ্যে নির্বাচনী ব্যয় রাখা সম্ভব হয় না। এটাকে বাড়িয়ে ১০ লাখ টাকা করা উচিত।

২০০০ : ১০ লাখ কি আপনি যথেষ্ট মনে করেন?

বি. চৌধুরী : হ্যাঁ, আমার তো মনে হয় যথেষ্ট হওয়া উচিত। কেননা আপনি বলেন, আর না বলেন, আপনার সমর্থকরা কিছু কিছু খরচ নিজের পকেট থেকে করবেই। আসলে খরচ সে ক্ষেত্রে আরো বেড়ে যায়।

২০০০ : বিএনপির সংসদীয় কমিটি হঠাৎ আপনার পদত্যাগ দাবি করলো কেন?

জামায়াতে ইসলামী এ দেশের কোনো দল নয়। এটি আন্তর্জাতিক দল। দলটির একটি শাখা হচ্ছে বাংলাদেশের এই জামায়াতে ইসলামী। এ দেশের গ্রামের অধিকাংশ জনগণই ধর্মপ্রাণ। কিন্তু তারাও জামায়াতের কার্যক্রমে কনফিউজড। রাষ্ট্রক্ষমতায় সে জামায়াতে ইসলামীকেই যে চায়, সেটি মনে করার কোনো কারণ নাই। এ দেশের আরও কিছু ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল আছে। তারা জামায়াতের কার্যক্রমের তীব্র বিরোধী। নির্বাচনে আমরা এদের সাহায্য নিতে পারি। জামায়াতকে নিউট্রালাইজ করার জন্য এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে

বি. চৌধুরী : সেটা তাদের জিজ্ঞেস করেন। তারা সুইসাইড করতে চেয়েছিল নিশ্চয়ই।

২০০০ : অথচ আপনি ছিলেন বিএনপির সবচেয়ে কাছের লোক...

বি. চৌধুরী : বললাম তো। এটাই আমার সবচেয়ে ভালো উত্তর- Without understanding they must have wanted to committed suiside. And that's what they have done. Sorry.

২০০০ : এই বিএনপির ভেতর থেকে প্রবীণ রাজনীতিবিদের কয়জন আপনার সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন?

বি. চৌধুরী : সেটা প্রবীণ রাজনীতিবিদরা জানেন। আপনারা এ বিষয়ে পত্রপত্রিকায় লেখেন। আমরা সেগুলো দেখি আর হাসি।

২০০০ : এ মুহূর্তে বিএনপির সংকটকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন? অনেকেই অনুমান করছে বিএনপির মধ্যে একটা অস্থিরতা কাজ করছে।

বি. চৌধুরী : আমারও এ রকম সন্দেহ। নাহলে হঠাৎ হঠাৎ তারা কেন আমার বিরুদ্ধে কথা বলবে।

২০০০ : এই অস্থিরতার জন্য বিএনপির তরুণ নেতৃত্ব কি দায়ী বলে আপনি মনে করছেন।

বি. চৌধুরী : আমি ঠিক নিশ্চিত নই। বিএনপিতে থাকলে হয়তো সেটা বলতে পারতাম। তবে এটা সম্ভব হতে পারে। তবে আমি যেহেতু বিষয়টা সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানি না সেক্ষেত্রে আমার পক্ষে উত্তর দেয়াটা আনফেয়ার হবে।

২০০০ : কিন্তু একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ হিসেবে আপনি তো বলতে পারেন?

বি. চৌধুরী : আমি যা বলবো, সেটা যেকোনো রাজনৈতিক নেতাই বলতে পারবে। হ্যাঁ, বিএনপির ইয়াং লিডারশিপ...

২০০০ : ব্যাপারটা কিন্তু 'ইয়াং লিডারশিপ' নয়। ব্যাপারটা 'ইয়াং একচ্ছত্র আধিপত্য'।

বি. চৌধুরী : হ্যাঁ, এই একচ্ছত্র আধিপত্য তো হবেই। যেকোনো দলেই হবে। দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র না থাকলে এ রকম তো হবেই। কিন্তু এটাই অস্থিরতার কারণ কি না, সেটা আমি ঠিক বলতে পারছি না।

২০০০ : বিগত ৩টি নির্বাচনকে বলা হয় বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এক বড় ভিত্তি। যেমন গণতন্ত্রই বর্তমান বাংলাদেশে আছে, সেটা ওই তিনটি নির্বাচনেরই ফসল.....

বি. চৌধুরী : গণতন্ত্র একটি চলমান ধারা। নতুন নতুন পরিস্থিতিতে, নতুন নতুন ঘটনা-দুর্ঘটনার সঙ্গে এটি বিচার হয়, পরীক্ষা হয়। তারপর ধীরে ধীরে গণতন্ত্র ম্যাচিউরড হয়। ব্রিটিশরা একবারেই গণতান্ত্রিক হয়ে যায়নি। ভারতের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

২০০০ : আমার প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। বিগত তিনটি নির্বাচনেই যে দল হেরেছে, তারা কারচুপির অভিযোগ এনেছেন। এই নির্বাচন তিনটি সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত অভিমত কি?

বি. চৌধুরী : শেষ পর্যন্ত কিন্তু সব পরাজিত দলই সংসদে গিয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, নির্বাচনগুলো মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ছিলো। তবে আরো গ্রহণযোগ্য করার স্কোপ আছে।

২০০০ : আপনি তো অনেক দিন সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন। দায়িত্ব পালন করেছেন বেশ কয়েক বছর। এই সময়ে আপনি এ দেশের জনগণের জন্য কি করেছেন বলে মনে করেন? নিজের প্রতি আপনার মূল্যায়ন কি?

বি. চৌধুরী : এক সময় স্বপ্ন ছিল এ দেশের মানুষ দুটি দল থেকে একটিকে বেছে নেবার কালচার রপ্ত করে। সে ক্ষেত্রে একক কৃতিত্ব আমি নেব না। তবে বিএনপি প্রতিষ্ঠায় আমার একটা অবদান তো রয়েছেই। দুটো দল থেকে বেছে নিতে হলে জনগণের জন্য কাজটা সহজ হয়ে যায়। আমেরিকায় এই সিস্টেম। ইংল্যান্ডে অবশ্য এখন প্রধান রাজনৈতিক দল তিনটি। আমাদের দেশেও এই অবস্থা পরিবর্তনের সময় এসেছে।

দ্বিতীয়ত, সংসদে কেমন করে মার্জিত ভাষায় সমালোচনা করা যায় সেটি আমি প্রতিষ্ঠা করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। এটা আমার আরেকটি অর্জন বলে মনে করি।

তৃতীয়ত, নির্বাচনকে বাক্সে মানে ইলেকট্রোনিক মিডিয়ায় নিয়ে আসা যায় সেটি আমি প্রমাণ করেছি। এবং সন্ত্রাস ও দুর্নীতি না করে যে রাজনীতি করা যায়, সেটি আমি করে দেখিয়েছি। এর ধারাবাহিকতায় আমি দেশের শেষ নির্বাচনেও নির্বাচিত হয়েছিলাম। এটা আরেকটি বড় অর্জন বলে আমি মনে করি।

আরেকটি কথা হলো, নতুন পার্টি সংগঠিত করছি। ইনশাল্লাহ এর মাধ্যমে আমি আমার মতো করে সুস্থধারার রাজনীতি করে যাবো।

২০০০ : জিয়াউর রহমানের সেই বিএনপির সঙ্গে বর্তমান বিএনপির তুলনা করলে চিত্রটা কি দাঁড়ায়?

বি. চৌধুরী : জিয়াউর রহমানের সময় সন্ত্রাস এবং দুর্নীতি এমন ব্যাপক তো ছিলই না বরং খুব কম ছিল। কেননা জিয়াউর রহমানের সময় জিয়াউর রহমান হিমসেলফ অ্যাজ এ টপ খুবই সৎ ছিলেন। এটা সত্য কথা, স্বীকার হতে হবে। জিয়াউর রহমানের কেবিনেট মিনিস্টাররাও সন্ত্রাস ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিল না। বলা চলে মোটামুটি। এখন বর্তমান বিএনপির সঙ্গে সেই চিত্র তুলনা করলে তো বেশ মুশকিলই।

২০০০ : আপনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আপনার ছেলে রাজনীতিতে এসেছে- আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মাহি চৌধুরী তাই বলেছিলেন। এখন দু'জন দু'প্ল্যাটফর্ম থেকে রাজনীতি করছেন। আপনি কি চান না আপনার ছেলে আপনার সঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে থেকে রাজনীতি করুক?

বি. চৌধুরী : খুব ভালো প্রশ্ন। কিন্তু মনে রাখতে হবে এখানে আমার দুটি সত্তা। একজন পিতা, অন্যজন রাজনীতিবিদ। বাবা হিসেবে আমি বলবো তুমি ওদের সঙ্গে থেকো না। কেননা দলটি সন্ত্রাস ও দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে, পচে গেছে। কিন্তু একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে আমি বলবো যে, ইউ হ্যাভ ইউর চয়েস।